বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.004

গিরিশ কারনাডের *হয়বদন* : পৌরাণিক রূপের আধুনিক নির্মাণ

আসমা ইয়াসমীন রুনা*

সারসংক্ষেপ

নিরীক্ষাপ্রিয় ভারতীয় নাট্যকার গিরিশ কারনাডের (১৯৩৮-২০১৯) অন্যতম সৃষ্টি *হয়বদন* (১৯৭১)। নাট্যরীতির প্রথাসিদ্ধতাকে অতিক্রম করে ঐতিহ্যিক ও পৌরাণিক বাস্তবতায় আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করায় তাঁর অপরিসীম উৎসাহ। *হয়বদন* নাটকে পৌরাণিক কাহিনি, লোককথা ও রূপকথার এক নতুন অর্থবহ পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। পুরাণের ওপর অধিষ্ঠিত এ নাটকে মানব অস্তিত্ব, আত্ম-পরিচয়ের দ্বন্দ্ব, অবদমিত কামনা ও মূল্যবোধের সংকটের মতো বহুলচর্চিত বিষয়সমূহের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যুক্ত হওয়ায় নাটকটি আধুনিক রূপ লাভ করেছে। সমকাল প্রভাবিত ও সম্পর্কিত পৌরাণিক অনুষঙ্গ অবলম্বনে গড়ে ওঠা *হয়বদন* কীভাবে আধুনিক নাট্যগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে তা অনুসন্ধানের প্রয়াস রয়েছে এই প্রবন্ধে।

চাবি শব্দ: গিরিশ কারনাড, নাটক, পুরাণ, ঐতিহ্য, আধুনিকতা।

১. ভূমিকা

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের এক অন্যতম রূপকার গিরিশ কারনাড। কন্নড় সংস্কৃতির জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠলেও তাঁর রচনায় বিশ্বজনীন নাট্যচেতনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তিনি ইতিহাস, পুরাণ এবং লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন যুক্তিবাদ ও আধুনিক জীবনবোধের একীকরণ ঘটিয়েছেন। উপাখ্যান, দৃষ্টান্তমূলক গল্প এবং ভুলে যাওয়া ঐতিহ্য থেকে আইডিয়া নিয়ে তিনি আজকের দিনের ভারতীয় নাটকে তা সংযুক্ত করেছেন। তাঁর প্রথম নাটক *যযাতি* (১৯৬০) *মহাভারতের* উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত যেখানে মানুষের কামনার অতৃপ্তি ও ভোগবাদী মানসিকতা মূর্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত *তুঘলক* (১৯৬৪) নাটকে তিনি সমকালীন রাজনীতির আদর্শবাদ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীকালে *নাগমণ্ডল* (১৯৮৭) ও *তালেদণ্ড* (১৯৮৯) নাটকের মাধ্যমে লোকগাথা, ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক কাঠামোর জটিলতাকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯৭১ সালে রচিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি *হয়বদন* নাটকের মূল কাহিনি-কাঠামো সংস্কৃত *কথাসরিৎসাগর* ও *বেতাল পঞ্চবিংশতি* থেকে সংগৃহীত হলেও এতে টমাস মানের *The Transposed Heads*-এর প্রভাব বিদ্যমান। নাটকের আঙ্গিক রচনা বিশেষ করে দৃশ্য ভাঙ্গার ক্ষেত্রে তিনি বাদল সরকারের (১৯২৫-২০১১) *এবং ইন্দ্রজিৎ* (১৯৬৩) নাটককে অনুসরণ করেছেন। ১৯74 সালে শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) এই নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

পৌরাণিক অনুষঙ্গের আড়ালে নাট্যকার এ নাটকের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের আত্মদ্বন্দ্ব, অতৃপ্তি, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, প্রণয় ও দাম্পত্যকেন্দ্রিক টানা- পড়েন, সামাজিক অসংগতি ও বিভ্রাটের চিত্র তুলে ধরেছেন।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো পৌরাণিক উপাদানের যথার্থ প্রয়োগ ও রূপান্তরের মাধ্যমে নাটকটি কীভাবে সার্বজনীন ও আধুনিক হয়ে উঠেছে তা নির্ণয় করা। একইসঙ্গে লোকজ ও পৌরাণিক অলৌকিকতাকে অনুসরণ করে সমকালীন সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের মনোজগতের নানা স্তরকে নাটকের পটভূমি, চরিত্র, ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্থাপনে কারনাড কতটুকু সার্থক হয়েছেন তা বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আলোচ্য গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩. প্রাক্-গবেষণা সমীক্ষণ

গিরিশ কারনাডের নাটককে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কিছু গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। Ars Artium থেকে প্রকাশিত Rajesh Kumar Pandey এর 'The Plays of Girish Karnad : Critical Perspective' এবং International Journal of Innovative Research In Technology's থেকে প্রকাশিত Arushi Chaudhary এর 'Significance of Girish Karnad's Hayavadana to Postcolonial Theatre in India' শিরোনামের প্রবন্ধসমূহে গিরিশ কারনাডের উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহের বিষয়, প্রবণতা ব্যাখ্যা এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে *হয়বদন* নাটকের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এছাড়া Indian Literary Narratives থেকে প্রকাশিত C. Samuel-এর 'The Self in the Role of Another : The Quest for Identity in Girish Karnad's Hayavadana and Naga-Mandala' নামক গবেষণায় *হয়বদন* ও *নাগমণ্ডল* নাটকের আত্ম পরিচয় অনুসন্ধান সম্পর্কিত বিশ্লেষণ রয়েছে। প্রভাতকুমার দাস সম্পাদিত *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে গিরিশ কারনাড* গ্রন্থে কারনাডের সামগ্রিক নাটকের অনুবাদ সম্পর্কিত বয়ান, নাট্যভাবনা, নাট্যনির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত, লোকসাহিত্য, ইতিহাস ও পুরাণের ব্যবহার সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা উপস্থিত। *হয়বদন* নাটকের বাস্তবতা ও নির্মাণ বিষয়ক প্রবন্ধ থাকলেও এ নাটকের পৌরাণিক অনুষঙ্গের আধুনিক নাট্যরূপ বিষয়ক কোনো গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি।

৪. পৌরাণিক অনুষঙ্গ ও আধুনিক নাট্যরূপ

আধুনিক নাটক এমন এক শিল্পরূপ, যেখানে সময়ের পরিবর্তনশীল চেতনা, সামাজিক বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাট্যরূপ লাভ করে। তবুও এই আধুনিকতা কেবল নতুনের অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি ঐতিহ্য অনুগামী বিশেষত পৌরাণিক উৎস থেকে সৃজনশীল অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেও ঋদ্ধ হতে পারে। পুরাণ বলতে ইতিহাস, আখ্যান-উপাখ্যান, ধর্মীয় বিধিবিধান ইত্যাদি সংবলিত এক শ্রেণির মিশ্র সাহিত্যকে বোঝায়।[১] পুরাণ শব্দটির মধ্যে পুরাতনের সংযোগ আছে, যার উদ্দেশ্য হল পুরাতন ঐতিহ্যকে বহাল রাখা।[২] পুরাণ অতীতের সঙ্গে বর্তমানে সংযোগ সৃষ্টি করে।

কবি বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'পুরাণ-কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে—শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে—বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।'[৩] এ শতাব্দীর সৃষ্টিশীল সাহিত্য নির্মাতাদের হাতে পৌরাণিক কাহিনি ও সমকালীন জীবন চেতনার সম্মিলনে নির্মিত হয়েছে কালজয়ী রচনা। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় নাট্য নির্মাতা ইব্রাহিম আলকাজির প্রযোজনায় জঁ আনুয়ই (১৯১০-১৯৮৭) এর *আন্তিগোনে* নাটক দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন গিরিশ কারনাড। ফরাসি নাট্যকারদের মধ্যে জঁ জিরোদ্যু (১৮৮২-১৯৪৪), জঁ-পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), জঁ আনুয়ই প্রমুখ লেখক প্রাচীন মিথ বা পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করে নাটক লিখেছেন।[৪] তাঁদের এই বিষয় ভাবনা গিরিশ কারনাডকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে পৌরাণিক বিষয়ানুষঙ্গী নাটক রচনায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'পুরাণ-ই হলো আধুনিক যুগের জটিল চিন্তাভাবনাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র শক্তিশালী বাহন।'[৫] ১৯৯৯ সালের *দ্য সানডে হেরাল্ড*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> আমরা ধরেই নেই পৌরাণিক পালা মানে হয় রাম নয় কৃষ্ণ এবং ভক্তি আশ্রিত, কিন্তু পুরাণ মানে আরও অনেক কিছু, অনেক বিস্ময়কর গল্প যেখানে ঐশ্বরিক যুগ কিছু নেই। বেদের আখ্যান একরকম উপনিষদের আখ্যান অন্যরকম... জোর করে আমি কখনও পুরনোর ধাঁচে নতুনকে ঢালার চেষ্টা করি না, যদি পুরা কথনের উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমি সমকালীন চেতনা রাখতে পারি তাহলে অনায়াসে সেটি এ যুগের হয়ে ওঠে।[৬]

পাশ্চাত্য রীতিতে উচ্চশিক্ষিত কারনাড সচেতনভাবে গ্রহণ করেন ভারতীয় ঐতিহ্যসমৃদ্ধ পুরাণ, মিথ ও দেশের ইতিহাসকে। বিশ শতকের অন্যতম নাট্যকার মোহন রাকেশ (১৯২৫-১৯৭২), বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১), ধরম বীর ভারতী (১৯২৬-১৯৯৭) ও বিজয় তেন্ডুলকর (১৯২৮-২০০৮) নাটকের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনবোধ প্রকাশের যে ধারা শুরু করেছিলেন তা নব্য ভারতের চিন্তা-চেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। গিরিশ কারনাড সেই ধারার অগ্রপথিক হয়েছিলেন।

মূলত দীর্ঘ প্রস্তুতি থাকার কারণে গিরিশ কারনাড *হয়বদন* নাটকে পুরাণ ব্যবহারে ছিলেন যথেষ্ট সচেতন ও পরিপক্ব। ১৯৭০ সালে হোমিভাবা ফেলোশিপের সুবাদে তিনি ভারতের গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রত্যন্ত এলাকায় যাওয়ার ও মানুষের সংস্কার, সংস্কৃতি, লোকজ বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। শৈশবে দেখা যক্ষ গানের স্মৃতিও ডালপালা বিস্তার করেছে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে। প্রায় একই সময়ে বাদল সরকারের *এবং ইন্দ্রজিৎ* (১৯৬৫) নাটক অনুবাদ ও মঞ্চস্থ করেন তিনি। এ সকল ঘটনা তাকে *হয়বদন* নাটক নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে। তিনি এ নাটকে দেখিয়েছেন ত্রিস্তরীয় ত্রিকালস্থিতি। 'পুরাণ-লোকায়ত-অভিজাত সমাজের ত্রিস্তরীয়তায় মূর্ত পুরাণ-ইতিহাস-সাম্প্রতিককাল।'[৭] নাটকের শেষ অংশে শোনা যায় জাতীয় সংগীত। বিশেষভাবে রাজনীতি সাপেক্ষ আধুনিক কালকে তিনি পাঠকের সামনে হাজির করেন।

'হয়বদন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ঘোড়ার মুখ। নাটকে ঘোড়ামুখো নামের এক রহস্যময় চরিত্রকে দেখা যায়, যার মাথা ঘোড়ার মতো হলেও দেহ মানুষের মতো। সে অসম্পূর্ণতা বর্জন করে নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পুরাণে আমরা গণেশ বা নৃসিংহ অবতারকে দেখি, যাদের মস্তক ও দেহ ভিন্ন প্রাণীর হলেও তারা 'সিদ্ধিদাতা' বা পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বর হিসেবেই

প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কারনাডের ঘোড়ামুখো তার সংকর রূপ নিয়ে লজ্জিত। নাটকের শেষে সে পুরোপুরি ঘোড়া হতে পারলেও তার কণ্ঠস্বর থেকে যায় মানুষের। এই যে পুরোপুরি কোনো কিছুই হতে না পারা অস্তিত্ববাদী-সংকট পৌরাণিক 'অবতার' ধারণার এক নিপুণ আধুনিক নির্মাণ, যা প্রমাণ করে আধুনিক পৃথিবীতে পূর্ণতা একটি অলীক কল্পনা মাত্র।

গিরিশ কারনাড এই নাটকে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে একটা যোগাযোগের সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন।[৮] ফলে নাটকটি 'দেশ-কাল' এর নির্দিষ্ট গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাচ্যের আঙ্গিক ও প্রতীচ্যের তত্ত্বের সম্মিলনে গড়ে ওঠে এই নাটকের প্লট বা কাহিনি কাঠামো; চরিত্র, ভাষারীতি, সংলাপ, গান, দৃশ্য, থট বা নাট্যকারের চিন্তনে নাট্যকারের নিরীক্ষাপ্রবণতা ও আধুনিক ভাবনার ছাপ স্পষ্ট।

৫. প্লট-বিন্যাস

পুরাণধর্মী নাটকে প্লটের মাধ্যমে ঘটনা ও চরিত্রের গতিমুখ নিয়ন্ত্রিত হয়। পৌরাণিক পটভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত *হয়বদন* নাটকটি সমকালীন হয়ে ওঠার পেছনে প্লটের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 'প্লট' বা আখ্যানভাগ বলতে কেবল ঘটনার সমাহারকে বোঝায় না, বরং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনাকে বোঝায় যার মাধ্যমে নাট্যকার বিভিন্ন ঘটনাকে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে সাজিয়ে তুলতে সমক্ষম হন। এরিস্টটলের মতে, 'ঘটনা তথা কাহিনীই নাটকের মুখ্য উপাদান।'[৯] আধুনিক নাটকের প্লটে নাট্যকারগণ ব্যক্তিগত দর্শন ও সমাজ-পরিস্থিতির ভবিষ্যৎমুখী প্রসঙ্গের অবতারণায় মূল প্লটের সঙ্গে যুক্ত করেন উপকাহিনি যেখানে অতীতের ইতিহাস ও পৌরাণিক প্রসঙ্গ বেশ সমাদর পায় । *হয়বদন* নাটকের গঠনশৈলী দ্বিমাত্রিক। একদিকে দেবদত্ত-কপিল-পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মূল কাহিনি, অন্যদিকে ঘোড়া-মানুষের সংকর সত্তা *হয়বদন*-এর উপকাহিনি। এই দুই ধারাকে কারনাড 'অপূর্ণতা' এবং 'পরিচয় সংকট' নামে দুইটি আধুনিক ভাবনায় গ্রথিত করেছেন। নাটকের মূল প্লট আবর্তিত হয়েছে ধর্মপুরের দুই বন্ধু সুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী ব্রাহ্মণ বংশীয় পণ্ডিত দেবদত্ত ও ক্ষত্রিয় বংশজাত বলবান লৌহ কারুকর কপিলকে কেন্দ্র করে। কপিলের সহায়তায় ধর্মপুরের সুন্দরী বেনে কন্যা পদ্মিনীর সঙ্গে দেবদত্তের প্রথমে প্রণয় এবং পরে পরিণয় সংঘটিত হয়। প্রণয়বোধ আর দাম্পত্যের একাধিপত্যের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দেবদত্ত কালী মন্দিরে গিয়ে নিজের শিরশ্ছেদ করে। বন্ধুর পরিণতিতে দুঃখিত হয়ে কপিলও একই পন্থা অবলম্বন করলেও মা কালীর বরে আবার দুজন প্রাণ ফিরে পায়। পদ্মিনী স্বেচ্ছায় দেবদত্তের মাথা কপিলের শরীরে ও কপিলের মাথা দেবদত্তের শরীরে জুড়ে দেয়। এই মস্তক বিনিময় বা ট্রান্সপোজড হেড মোটিফটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও পৌরাণিক আখ্যানগুলোতে পরিচিত। প্রাচীন আখ্যান সোমদেব ভট্টর *কথাসরিৎসাগর*-এর সূত্র ধরে এখানে মস্তক বিনিময় বা ট্রান্সপোজড হেড মোটিফটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারনাডের আধুনিকতা এখানেই যে, তিনি কেবল অলৌকিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছেন যার মাধ্যমে মাথা ও শরীরের আলাদা পরিচয়ের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয়েছে। এই নাটকে 'মানুষের সব প্রত্যঙ্গের মধ্যে গুরুত্বে, অবস্থানে, মাথাই হচ্ছে সেরা।'[১০] প্রাচীন ভারতীয় এই বিচারবুদ্ধিকে জীবন ও জৈবিকতা কীভাবে চ্যালেঞ্জ করে তিনি তা দেখিয়েছেন। দেবদত্তের শির

কপিলের শক্তিশালী শরীরে প্রতিস্থাপনের পর প্রথমদিকে সে দেবদত্তের মতো আচরণ করলেও, ধীরে ধীরে কপিলের শরীরের পেশি-স্মৃতি তাকে আবার শিকার ও কায়িক পরিশ্রমের দিকে ধাবিত করে। অর্থাৎ মানুষের সংস্কার কেবল মাথায় নয়, তার পেশিতে ও রক্তেও থাকে– যা এ নাটকে পুরাণে চর্চিত বুদ্ধিবাদের স্থলে জৈবিকতাকে প্রাধান্য দেয়।

পরিবর্তিত শরীরের কপিল ও দেবদত্ত উভয়েরই পদ্মিনীকে কেন্দ্র করে মানসিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা একে অপরকে হত্যা করে। নাট্যকার এ পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'ওরা জ্বলল, ওরা বাঁচল, ওরা যুঝল, ওরা মরল।'[১১] পদ্মিনী চরিত্রটি ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র দ্রৌপদী ও রাধার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হলেও সমধর্মী নয়। পুরাণে বর্ণিত দ্রৌপদী বা রাধা একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে তাদের জীবন নির্বাহ করেছে কিন্তু আত্মমর্যাদাশীল পদ্মিনীর পক্ষে পারস্পরিক বিরোধ, অনিশ্চয়তা আর দোদুল্যমানতার সঙ্গে সহাবস্থান করে সঙ্গীসুখ লাভ করা সম্ভব হয়নি। তাই সে সতীদাহের মাধ্যমে নিজেকে বিসর্জন না দিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর মাধ্যমে নিজেকে মুক্তি দিয়েছে। পুরাণে বর্ণিত নারীদের সঙ্গে পদ্মিনীর জীবনবোধ ও মর্যাদাবোধের স্বাতন্ত্রিক কাহিনি এই নাটককে আধুনিক করে তুলেছে।

এই নাটকের কাহিনির সঙ্গে পৌরাণিক ভাবাশ্রয়ী ঘোড়ামুখোর উপকাহিনি একটি রূপক হিসেবে কাজ করে। গন্ধর্ব পিতা ও রাজকন্যা মায়ের ঘোড়ামুখো পুত্র নিজের অস্বাভাবিক অবয়ব নিয়ে বিব্রত। পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে এমন রূপান্তর প্রায়ই দেবতা বা ঋষির অভিশাপ বা আশীর্বাদের ফলে ঘটে থাকে। দেবতার অভিশাপের কারণে খণ্ডিত অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা এই চরিত্রটি কেবল কৌতুকপূর্ণ নয় বরং মানুষের চিরন্তন অসম্পূর্ণতার প্রতীক। মূল কাহিনিতে যেমন দেবদত্ত ও কপিল নিজেদের পূর্ণতা খুঁজে পায়নি, ঘোড়ামুখোও একইভাবে পূর্ণতার সন্ধানী। অনুনয়ের স্বরে সে অধিকারীকে বলে, 'আমাকে পুরো মানুষ করে দিন, সম্পূর্ণ মানুষ।'[১২] দেবী কালীর বরে সে মানুষের মাথা নয় মানুষের কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট অশ্বমুণ্ড লাভ করে। এই উপকাহিনিটি মূল প্লটের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগিয়ে যায় এবং এটি প্রমাণিত হয় মানুষের আত্মপরিচয় অন্বেষণ এক অন্তহীন ও জটিল প্রক্রিয়া। আদতে, গিরিশ কারনাড প্রাচীন *কথাসরিৎসাগর* বা *বেতালপঞ্চবিংশতি*র গল্পকে কেবল গ্রহণ করেননি, বরং তাকে নবরূপ দান করেছেন। মস্তক ও শরীরের পৃথক পরিচয়ের দ্বন্দ্ব, লিঙ্গীয় রাজনীতি এবং সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নগুলোকে তিনি এমনভাবে যুক্ত করেছেন যে, মূল ও উপকাহিনি মিলে একটি অখণ্ড আধুনিক জীবন দর্শনের দলিল হয়ে উঠেছে। যেখানে মানুষের জৈবিকতা ও বুদ্ধিবাদ একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধুনিক অস্তিত্বের সংকটকেই ফুটিয়ে তোলে।

৬. চরিত্র চিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব

পুরাণাশ্রয়ী আখ্যানে সংঘটিত পূর্বাপর ঘটনাসমূহের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে চরিত্রের অগ্রগণ্য ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য, যা আধুনিক ভাবাপন্ন *হয়বদন* নাটকের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কারনাড তাঁর নাটকে পৌরাণিক কিছু বৈচিত্র্যময় চরিত্রের অনুষঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন

আধুনিক জীবন সংকটের নানা রূপ। মূলত, ঘটনার চালক-শক্তিরূপে চরিত্রকে বিবেচনা করা হয়।[১৩] *হয়বদন* নাটকে পৌরাণিক ও অপৌরাণিক উভয় ধরনের চরিত্রের সংস্থিতি ঘটলেও অপৌরাণিক চরিত্রগুলো নাটকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে। অপৌরাণিক চরিত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে এবং তাদের পরিচালিত করতে পৌরাণিক চরিত্রগুলো ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে। *হয়বদন* নাটকের অন্যতম চরিত্র দেবদত্ত *মহাভারতের* যযাতির সঙ্গে তুলনীয়। যযাতি তার কনিষ্ঠ পুত্রের কাছে নিজের জন্য যৌবন প্রার্থনা করে। পিতার অনুরোধে কনিষ্ঠপুত্র পুরু নিজের যৌবন পিতাকে অর্পণ করে, ফলে যযাতি ভোগে প্রবৃত্ত হয়। 'কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃত সংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়।'[১৪] পৌরাণিক চরিত্র যযাতির ন্যায় *হয়বদন* নাটকের ব্রাহ্মণ বংশীয় দেবদত্ত দৈহিকভাবে নির্জীব। তাই ক্ষত্রিয় বংশজাত কপিলের দেহ লাভ করে দেবদত্ত দুঃখিত হয় না। পৌরাণিক চরিত্র যযাতির বৈশিষ্ট্যধারী দেবদত্ত আধুনিক ভোগবাদী মানুষের প্রতিরূপ, যার কাছে হৃদয়ের চেয়ে শরীরী ভাবনা বেশি গুরুত্ব পায়। কপিল চরিত্রটি *মহাভারতের* ভীম চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি ভীমের সবচেয়ে বেশি অনুরাগ থাকলেও দ্রৌপদীর প্রথম ভালোবাসা ও প্রিয় স্বামী ছিল অর্জুন। দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম কৈলাসশিখর ও কুবের ভবনের নিকটবর্তী একটি নদী থেকে পদ্ম সংগ্রহ করে আনে। তেমনি 'হাত ভর্তি ফুল নিয়ে এল কপিল, ঢেলে দিল সামনে।'[১৫] যদিও দেবদত্তের প্রতি পদ্মিনী বেশি অনুরক্ত ছিল। *মহাভারতের* ভীম দ্রৌপদীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে লাভ করলেও *হয়বদনে* বংশমর্যাদা ও সামাজিক সংস্কারের কারণে পদ্মিনীর সঙ্গে কপিলের মিলন হয়নি। পৌরাণিক চরিত্র ভীমের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের বিপরীতে কপিলের পরাজিত প্রতিমূর্তির চিত্রায়ণ প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সমাজের শোষিত মানুষের সীমাবদ্ধতার প্রতীক। নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র পদ্মিনী সৌন্দর্য, কামনা ও সামাজিক প্রত্যাশার প্রতীক। তার রূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'যক্ষিণী, শকুন্তলা, উর্বশী, মধুমতী সব একসঙ্গে গুলে যেন তৈরি এই মেয়ে!'[১৬] পদ্মিনী নিজের জীবন ও যৌবনের দাবি সম্পর্কে সচেতন আধুনিক নারীর লক্ষণাক্রান্ত। এই চরিত্রটি পৌরাণিক সতীত্ব বা একনিষ্ঠতার ধারণাকে আধুনিক মনস্তত্ত্ব দিয়ে ভেঙেছে। অহল্যা, কুন্তী, মন্দোদরী, দ্রৌপদী, তারার জীবনে একাধিক পুরুষ গ্রহণের পেছনে কোনো না কোনো দৈব বিধান বা অভিশাপের বাধ্যবাধকতা থাকলেও পদ্মিনীর ক্ষেত্রে তেমন ছিল না। সে সচেতনভাবে দেবদত্তের মেধা এবং কপিলের বলিষ্ঠ শরীরকে একসঙ্গে পেতে চায়। সে যখন ভুল করে মস্তক বিনিময় ঘটায়, তা আসলে তার অবচেতনের সেই 'সম্পূর্ণ পুরুষ'কে পাওয়ারই এক ব্যাকুল চেষ্টা। নিজের কামনার প্রতি পদ্মিনীর এই উন্মাদনা তাকে চিরাচরিত পৌরাণিক 'পতিব্রতা' ইমেজ থেকে বের করে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সে আসলে নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত। পৌরাণিক রচনায় দেবী কালীকে রুদ্ররূপে দেখতে পাওয়া যায়। সে অসুরদের দমন করে, কাউকে অসির আঘাতে বধ, কাউকে খড়্গ দিয়ে তাড়না বা কাউকে ভক্ষণ করে। *মার্কণ্ডেয় পুরাণে* উল্লেখ আছে :

> চণ্ড ভীষণ ও ভীমলোচনা কালীর দিকে ধাবিত হয়ে ভয়ঙ্কর শরবর্ষণে ও মুণ্ড সহস্র চক্র নিক্ষেপ করে তাঁকে আচ্ছন্ন করল। সেই সব চক্র কালীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করল। তিনি রোষান্বিত হয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন করে হাসতে

> লাগলেন। ... তিনি সিংহে আরোহণ করে চণ্ডের দিকে ধাবিত হলেন এবং তার চুলের মুঠি ধরে অসির আঘাতে মুণ্ডচ্ছেদ করলেন ।[১৭]

পুরাণের ভয়ংকর ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের কালীর বিপরীতে *হয়বদন* নাটকে দেখতে পাওয়া যায় ভিন্ন কালীরূপ। এই নাটকে কালী অত্যন্ত ক্লান্ত, সে হাই তোলে এবং ভক্তের প্রার্থনায় বিরক্ত হয়। দেবী কালী অনেকসময় তার ভক্তদের সঙ্গে রসিকতাও করে। এখানে ঈশ্বর মানুষের দুঃখে বিচলিত নয়, বরং মানুষের নির্বুদ্ধিতায় কিছুটা আমোদ পায়। কালীর এই রূপ আধুনিক যুগের ঈশ্বরহীনতার ধারণার সমান্তরাল; যেখানে মানুষ নিয়তি নয় কর্মে বিশ্বাসী। নাটকের পৌরাণিক চরিত্র ঘোড়ামুখো অর্ধমানব ও অর্ধপ্রাণীর দেহধারী বিশেষ প্রাণী। *শ্রীমদ্ভাগবতম্* গ্রন্থে এ প্রাণীকে 'মনুষ্যের শরীর ও অশ্বের মস্তকযুক্ত মূর্তি'[১৮] হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে পরিচিত হয়গ্রীবকে গতি, শক্তি ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই নাটকে ঘোড়ামুখো তার শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যবহার করে পূর্ণ মানুষ হতে চেয়ে পূর্ণ ঘোড়ায় পরিণত হয় ফলে তার অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। পূর্ণতা পিয়াসি ঘোড়ামুখোর আত্মসন্ধান মূলত আধুনিক মানুষের আত্মদর্শনের প্রতীক। পৌরাণিক রীতি অনুসারে, 'সকল কর্মের প্রারম্ভে গণেশের পূজা করা হয়।...গণেশ মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক বলে সকল দেবতার আগে পূজিত হন।'[১৯] ঐশ্বরিক ক্ষমতাবান গণেশকে বিঘ্ন দূরকারী, শুভ ও সমৃদ্ধির দেবতা হিসেবে আরাধনা করা হয়। *হয়বদন* নাটকের শুরুতে গণেশ বন্দনা করা হলেও দেবদত্ত, কপিল ও পদ্মিনীর জীবনে সংকট দূরীভূত হয়ে সুদিন আসেনি এবং তারা কেউ বাঁচতে পারেনি। শারীরিক ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে তাদের জীবনাবসান হয়। এ নাটকে পৌরাণিক গণেশ দেবতার অপার করুণার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে আধুনিক মানুষের অপূর্ণ হৃদয়ের আর্তি ও সত্তা সন্ধানের তীব্র প্রচেষ্টা।

৭. ভাষা ও সংলাপের নবনির্মাণ

পৌরাণিক ভাবসমৃদ্ধ নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্রের অন্তর্মানস ও পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপনে ভাষাকে আধেয় রূপে বিবেচনা করা হয়। *হয়বদন* নাটকে যার যথোপযুক্ত প্রয়োগের ফলে এটি আধুনিক নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে। ভাষার প্রয়োগে অর্থাৎ সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকারের অভিপ্রায় ও চরিত্রের গভীর মানবিক বা ঐশ্বরিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত, ভাষা ও সংলাপ একে অপরের পরিপূরক। নাটকের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের ভিত্তিতে রচিত হয় সংলাপের ভাষা। কারনাড সংলাপের ভাষা নির্মাণের প্রয়োজনে কখনো চরিত্রানুগ বাস্তব কখনো বা কাব্যধর্মী অলংকৃত ভাষার প্রয়োগ করেছেন যা একাধারে পৌরাণিক ও আধুনিক ভাবধারার বাহক।

পৌরাণিক রচনা মূলত ভক্তি, বিশ্বাস এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। এখানে দেব-দেবী, অলৌকিক ঘটনা ও ক্ষমতার প্রাধান্য থাকে বিধায় এর ভাষা হয় গম্ভীর ও ভক্তিপূর্ণ। দেবতা, সাধু বা অতিমানবিক চরিত্রের ভাষায় সাধারণত প্রাচীন কাব্যময়তা, আলংকারিক ও ঐশ্বরিক মহিমাজ্ঞাপক শব্দ লক্ষ করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতম্* গ্রন্থে হয়গ্রীব দেবতার ভাষার এরূপ বিবরণ রয়েছে :

আমি প্রলয়সমুদ্রে বিচরণশীল সর্ব্ব-কারণ মৎসরূপী এবং মধু-কৈটভ-বিনাশন হয়শীর্ষ-রূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে ভগবন্, আমি মন্দরধারী বৃহদাকৃতি কূর্ম্মরূপী এবং প্রলয় সলিল-মধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধারশীল বরাহরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি।[২০]

অন্যদিকে পুরাণাশ্রয়ী রচনায় দেব-দেবীকে অতিলৌকিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। তারা মর্ত্যের মানুষের মতো আবেগ-অনুভূতি ধারণ ও প্রকাশ করে বিধায় তাদের ব্যবহৃত ভাষা হয় অলংকারবিবর্জিত, লৌকিক ও সাবলীল। অনেক সময় ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয় যা আধুনিক ভাববাহী। *হয়বদন* নাটকে বিরক্ত ও বিব্রত কালীর মনোভাব তার ভাষায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত :

কা। হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে। সে এক সময় ছিল বটে– অনেক অনেক আগে– এই সময়টায় হতো মঙ্গলারতি। হাজার হাজার ভক্তে ছেয়ে থাকত প্রাঙ্গণ, শাঁখ ঢাক করতালে কানে তালা লেগে যেত। এ সময়টা তাই আমায় জেগে থাকতেই হতো। এখন অভ্যাসটা চলে গেছে [হাই তুলে] বেশ, বলো কী চাও। বলে ফেলো। খুশি হয়েছি তোমার ওপর।[২১]

পৌরাণিক রচনায় সংস্কৃত শব্দ ও সাধু রীতির সমন্বয়ে যে ভাষাশৈলী গড়ে উঠেছে তার মাধ্যমে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, নৈতিক মুল্যবোধ বা প্রতীকী অর্থবহ ভাব প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে পুরাণের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট আধুনিক রচনায় সংস্কৃত, বাংলা ও দেশি শব্দ সহযোগে গঠিত ভাষায় দৈব ভাব ব্যতিরেকে মানুষের মানবীয় ও জীবনমুখী ভাবনা প্রকাশিত হয়। এমনকি বিষয়ের প্রয়োজনে কখনো কখনো নাটকে আটপৌরে শব্দও জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মিশ্র শব্দের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রের প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরার বিষয়টি এই নাটকে শব্দ প্রয়োগে আধুনিকতার দিকটি প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন :

নট। মাইরি না। দিব্যি করে বলছি। বিশ্বাস করুন, সাতদিনের মধ্যে আমি শুঁড়িখানার ছায়া মাড়াইনি। আজ এমন-কী এক-বাটি দুধও খাইনি।[২২]

পুরাণে দেব-দেবী বা পৌরাণিক চরিত্রদের কীর্তিকলাপ প্রকাশ বা বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর অথচ বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা প্রকাশে উইটের ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কারনাড পরিবেশ ও চরিত্রানুযায়ী যথাযথ ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বিষয়ের প্রয়োজনে উইটের প্রয়োগও করেছেন। বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরসের আবরণে নাট্যকারের মননশীল ও বাস্তবসম্মত ভাবনার সমন্বিত প্রকাশ এই নাটকের উইট ব্যবহারে আধুনিকত্ব দান করেছে। দেবী কালীর বক্তব্যের মাধ্যমে *হয়বদন* নাটকে উইটের প্রকাশ বেশ হাস্যরসাত্মক :

কালী। বজ্জাত সব, হাড়বজ্জাত! মরবার আগেও মিথ্যা না বলে ছাড়ে না। ঐ যে দেবদত্ত–প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, মাথাটা দেবে রুদ্রকে আর হাত দুটো দেবে আমায়। ভেবে দেখো ব্যাপারটা— মাথাটা ওকে, আর হাত দুটো আমায়!... তারপর এই কপিল! মরল আমার সামনে—কিন্তু কী, না, বন্ধুর জন্য! ভেবে দেখো! ভদ্রতা করেও একবার আমার কথা বলল না।[২৩]

পুরাণের ভাষায় ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করে অতীতের কোনো ঘটনা প্রকাশ, কোনো চরিত্রের আদি ইতিহাস, আরাধনা বা যুদ্ধজয়ের কাহিনি উপস্থাপনের প্রচলন রয়েছে। তেমনি পুরাণাশ্রিত

রচনায় সমকালীন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন তুলে ধরতে, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে এবং অতীতের সঙ্গে বর্তমান পাঠকের সংযোগ সাধনে এটি ভূমিকা রাখে। কারনাডের নাটকে অধিকারীর বক্তব্যের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয় :

> অধিকারী। হে বক্রতুণ্ড-মহাকায়, এই উল্‌টোপাল্‌টা শরীর নিয়ে তুমিই পূর্ণতার দেবতা, এই অন্যের মুণ্ড ঘাড়ে নিয়ে তুমি সিদ্ধিপতি–এই রহস্যের কিনারা করবে কে? ... আমরা কেবল সেই গজানন পরম পিতাকে প্রণাম জানিয়ে, শুরু করছি আমাদের পালা। এই হচ্ছে ধর্মপুর। এই শহরের রাজা ধর্মশীলের যশ আর রাজ্য এরই মধ্যে দশদিগন্তে পৌঁছে গেছে। এই শহরেরই দুই যুবাপুরুষ আমাদের নায়ক।[২৪]

ভাষার বাহন-রূপ সংলাপকে বলা হয় নাটকের প্রাণ। কারনাড সংলাপের বিন্যাস, শব্দচয়ন, অলংকার, ছন্দ এবং ভাষার ভঙ্গিতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যা একদিকে দর্শকের মনে পৌরাণিক কল্পলোকের স্মৃতি জাগায়, অন্যদিকে সমসাময়িক বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। পুরাণে পৌরাণিক চরিত্র, দেবতা ব্যতিরেকে প্রাণীর মুখে সংলাপের বিবরণ রয়েছে। লোককথা বা রূপকথার গল্পে নানারকম পাখি ও প্রাণী যেমন : কাক, তোতা, ময়না, শেয়াল, খরগোশ, হরিণ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে তেমনি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে ঘোড়ার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। পুরাণের অনুপ্রেরণায় নির্মিত *হয়বদন* নাটকে ঘোড়ার মুখে সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ঘোড়ার শরীরে মানুষের কণ্ঠ বয়ে বেড়ানোর বিড়ম্বনা। আধুনিক মানুষের জীবনের আবেগ, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা, বিভ্রাট ইত্যাদি নানা অনুভূতি প্রকাশে প্রাণীর মুখে সংলাপের প্রয়োগের মাধ্যমে মূলত পুরাণের নবসৃজন ঘটেছে।–

> ঘ। পুরো ঘোড়া হয়েছি বটে, কিন্তু আমি তো পুরো একটা সত্তা নই! এই যে মানুষের গলা–নচ্ছার মানুষের গলা–এ তো এখনও রয়েই গেল। তাহলে 'পুরো' বলা যায় কী করে? যদি ঘোড়ার মত চিঁহি-চিঁহি করতে পারতাম আমি, যদি পারতাম! কী করব আমি অধিকারীমশাই?[২৫]

পুরাণে জড় পদার্থ পুতুলের মাধ্যমে অনেক সময় অলৌকিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস বা কিংবদন্তি প্রকাশ করা হয়। পুরাণের ছাঁচে নির্মিত *হয়বদন* নাটকে পুতুলগুলোর সংলাপের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তববাদী মানুষের সংকট ও নিঃসঙ্গতার নানা রূপ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন :

> পু ১। বাঁ চোখটা সেদিন খেয়ে নিল আরশোলা।
> পু ২। ছমাস জুড়ে কেউ আসে না কাছে।
> পু ১। ছ মাস ধরে কেউ ছোঁয় না আমায়।
> পু ২। ছমাসেই এই হাল! বছর ঘুরলে হবে কী![২৬]

গিরিশ কারনাড চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও প্রতিবেশের ওপর নির্ভর করে *হয়বদন* নাটকের ভাষা ও সংলাপ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে লোকজধর্মী, সাবলীল ও বাহুল্যবর্জিত ভাষা ও উপযুক্ত সংলাপে দেহ-মনের দ্বন্দ্ব, আত্মপরিচয় সংকট ও চিরন্তন অসম্পূর্ণতার মতো দার্শনিক প্রতীতিকে উপস্থাপন করায় এটি এক অনন্য আধুনিক নাটকরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

৮. সংগীত ও দৃশ্যায়নে আধুনিকত্ব

পুরাণাশ্রিত কাহিনির ধারাবাহিকতা রক্ষা, চরিত্র-চিত্রণ ও আধ্যাত্মিক আবহ তৈরির মাধ্যম হিসেবে সংগীতের ব্যবহার বেশ প্রচলিত, যা *হয়বদন* নাটকের চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা এবং দৃশ্যপট পরিববর্তনের গতিময়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। সংগীতের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে নাট্যকার *হয়বদন* নাটকে আধুনিকতার দিকটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। চরিত্র এবং কাহিনির প্রয়োজনে ব্যবহৃত বারোটি গানের মাধ্যমে *হয়বদন* নাটকের কাহিনি গতি লাভ করেছে। নাটকের শুরুতে স্তোত্রগান ও শেষে সমাপ্তিসূচক মঙ্গল গীতি ছাড়াও বাকি গানগুলোর ছয়টি অধিকারী এবং মেয়েদের কোরাসে গাওয়া। আর বাকি চারটি গানের একটি গেয়েছে পদ্মিনী ও তার ছেলে, জাতীয় সংগীত গেয়েছে ঘোড়ামুখো এবং কপিল, দেবদত্ত গেয়েছে দু-টি গান। নাটকের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে অধিকারী আর জুড়িদের স্তোত্রগানের মাধ্যমে মূলত গণেশ বন্দনা করা হয়। কন্নড় সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী যজ্ঞগানের অনুপ্রেরণায় নাট্যকার *হয়বদন* নাটকের সংগীত নির্মাণ করেছেন। লোক-ঐতিহ্যমূলক এ গানের প্রয়োগ *হয়বদন* নাটকটিকে একই সঙ্গে ঐতিহ্যনিষ্ঠ ও আধুনিক করেছে। যক্ষগানের রীতি অনুযায়ী ভাগবত নাটকের ঘটনার বিবরণ দেন। *হয়বদন* নাটকে ভাগবতের ন্যায় অধিকারীও গানের মাধ্যমে নাটকের প্রধান চরিত্র ধর্মপুরের দুই তরুণের বন্ধুত্বের জয়গান করেছেন :

ওরা দুজন প্রাণের দোসর
একই হৃদয়মন।
হঠাৎ পাশে আনল নারী
এ কোন্ আমন্ত্রণ।
কী ছিল তার চলায় বলায়
… বোঝে না দুইজন।[২৭]

ভারতীয় পুরাণে বা লোককথায় ব্যবহৃত ঘুমপাড়ানো গান কাল্পনিক চরিত্র, সহজ সুর ও পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ সহযোগে গড়ে ওঠে। ফলে এসব গানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কল্পলোকের বর্ণনা পরিবেশিত হয়। *হয়বদন* নাটকে পদ্মিনী তার গর্ভে জন্ম নেয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য গানের আশ্রয় নেয়। এসকল গানের মাধ্যমে ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতার পাশাপাশি সন্তানের সঙ্গে সুখস্মৃতি বা আবেগীয় সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরা হয়।–

পঙ্খীরাজে আসে কুমার
কোন্ দেশে তার বাস
মাথায় জ্বলে সোনার চূড়া
… ঘুমোয় আমার খোকনমণি
স্বপ্নে ভাসে কী স্বর![২৮]

এছাড়া এ নাটকের শেষে ঘোড়ামুখোর মুখে জাতীয় সংগীতের তৃতীয় স্তবক শোনা যায়। অর্ধমানব অর্ধপ্রাণীর দেহ নিয়ে বিরাজমান ঘোড়ামুখো পৌরাণিক আদলে বিদ্যমান একটি অপরিপূর্ণ চরিত্র। এই ধরনের একটি চরিত্রের মুখে কারনাড জাতীয় সংগীত জুড়ে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক রীতির যোগসূত্র স্থাপন করেছেন।

পুরাণভিত্তিক আখ্যানে পৌরাণিক পটভূমি, অতিপ্রাকৃত উপাদান ও ঐতিহ্যিক উপাচার দৃশ্যরূপ লাভ করে বর্ণনা ও কল্পনার সুসামঞ্জস্যে, *হয়বদন* নাটকেও সে সামঞ্জস্য প্রকাশ্য। *হয়বদন*-এ কারনাড মঞ্চ নির্দেশনা ও দৃশ্যরূপায়ণে পৌরাণিক আবহ তৈরি করেছেন মূলত মানব অস্তিত্বের শাশ্বত সংকটের সর্বকালীন বাস্তব দৃশ্যায়ন ঘটাতে। বস্তুত, ঘটনার পটভূমি, পাত্র-পাত্রীর অবস্থান বা ঘটনার সংকেত দৃশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। পুরাণে বর্ণনামূলক দৃশ্যের মাধ্যমে সাধারণত পুরাকালের ভূগোল, প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও অলৌকিক জগতের চিত্র রূপায়ণ করা হয়। পুরাণাশ্রয়ী *হয়বদন* নাটকের দৃশ্য নির্মাণের প্রয়োজনে মঞ্চ কখনো হয়ে ওঠে ধর্মপুর, চিত্রকূট পাহাড়, উজ্জয়িনী, নন্দনপুর, পবনবীথি, অরণ্য, পথ, পাহাড়, কালী মন্দির প্রভৃতি স্থান। এইসকল চেনা-অচেনা নামধারী জনপদের সঙ্গে পৌরাণিক স্থানের সাদৃশ্য মেলে। নির্দিষ্ট কিছু স্থানকে অবলম্বন করে এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হলেও নাটকের দর্শক ও পাঠক উপলব্ধি করে অস্তিত্বের টানাপড়েন মানব জীবনের এক শাশ্বত সত্য অনুভূতি। নাটকের কেন্দ্রভূম প্রাচীন ভারতবর্ষ হলেও তার বার্তা চিরন্তন। মঞ্চায়নে দৃশ্যসজ্জা, চরিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ, সময় বিভাজন ও শরীরী ভাষা উপস্থাপনে নাট্যকারের নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয় যা নাটকের দৃশ্যায়নে আধুনিকত্বের দিকটি সুস্পষ্ট করে।–

> অ। ও আসছে! ওটা আসছে!... [এক ফুট মতো নামল পর্দা। ঘোড়ামুখোর মাথা দেখা গেল, মাথায় ঢাকনা। লোকদুটি অধিকারীর নির্দেশে ঢাকনা তুলে দিল। ঘোড়ামুখো প্রথমে টের পায়নি যে মাথাটা দেখা যাচ্ছে। টের পেতেই টুক করে নামিয়ে নিল মাথা।] ঘোড়া !! [পর্দা আরও একটু নামানো হলো। মাথাটি ও লুকোল। পর্দা আরও একটু, মাথা আরও একটু এমনি করে একেবারে মেঝেয় নামিয়ে দেয়া হলো পর্দা।][২৯]

নাট্যকার ঐতিহ্যবাহী কন্নড় যক্ষগানের সংগীতরীতি এবং দৃশ্যায়নকে চমৎকারভাবে একীভূত করেছেন পুরাণের চেনা-অচেনা স্থান ও চরিত্রের আবহে। কার্যত আধুনিকীকরণের এই সুনিপুণ নিরীক্ষণ নাটকটিকে একই সঙ্গে ঐতিহ্যনিষ্ঠ, প্রাণময় ও কালজয়ী করে তুলেছে।

৯. থট বা ভাবনা উপস্থাপন

পৌরাণিক অনুষঙ্গ, অলৌকিক ও লোকজ পরিমণ্ডলের প্রেক্ষাপটে নির্মিত থট বা ভাবনা পুরাণভাবাশ্রয়ী নাটকে অপরিহার্যরূপে প্রতীয়মান হয়, *হয়বদন* নাটকের ভাবনার প্রকাশেও তা দৃশ্যমান। কারনাড *হয়বদন* নাটকের পুনর্নির্মাণে ভাবনার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 'সাহিত্যে জীবনের ঘটনার দিকটি কাহিনীতে, হৃদয়ের দিকটি চরিত্রে এবং মস্তিষ্কের দিকটি ভাবনায় প্রতিফলিত হয়।'[৩০] পৌরাণিক নাটকে ভাবনায় ধর্মীয় বিষয়, আধ্যাত্মিকতা, কিংবদন্তি, কাল্পনিকতা বা সমকালীন প্রথা বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। *হয়বদন* নাটকে ভাবনার মাধ্যমে আধুনিক মানুষের অন্ধ সংস্কার, প্রচলিত রীতি, সামাজিক ও মনোজাগতিক সংকট ও তার ফলে সৃষ্ট সমস্যার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– নাটকের মূল আখ্যানে দেবদত্ত-কপিল ও পদ্মিনীর ত্রিভুজ প্রেম এবং তা থেকে উদ্ভূত দাম্পত্যের টানাপড়েন, সম্পর্কের বিযুক্তি, অস্তিত্বের সংকট ও সহিংসতার চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে সংকর সৃষ্টি ঘোড়ামুখোর জীবনচক্রের মাধ্যমে অসম্পূর্ণতা, হতাশা, অর্থহীনতা, ক্ষমা, পুনরুজ্জীবন ও জীবনমুখীনতার মতো বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত *হয়বদন* নাটক সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেন :

> Karnad's handling of the sources of his plots makes it abundantly clear that his interpretation of the ancient Indian story not only differs substantially from his originals but also indicates a bold attempt at investigation an old legend with new meaning.[৩১]

মূলত, নাটকে কাহিনির বাহ্যিক রূপকে ছাপিয়ে দর্শক ও পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননশীল জগৎকে নাড়া দেওয়াই ভাবনার মূল লক্ষ্য। দেশীয় নাট্যরীতি ও প্রাচীন ধ্রুপদী পুরাণের সার্থক প্রয়োগে গড়ে ওঠা থট মানুষের জীবনের অর্ন্তনিহিত সত্যকে সফলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বলেই *হয়বদন* সর্বোপরি আধুনিক নাটক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

১০. আধুনিক সাহিত্য-চিন্তার প্রকাশ

পুরাণভিত্তিক রচনার নবসৃজনে আধুনিক সাহিত্য-চিন্তার প্রভাব অনস্বীকার্য। কারনাড আধুনিক সাহিত্যের চিরায়ত সৃষ্টি *হয়বদন* নাটকে অস্তিত্ববাদ, অ্যাবসার্ডবাদ, দূরত্বায়ন কৌশল (Alienation Effect) ও জাদুবাস্তববাদী ধারার সঙ্গে প্রাচ্য পুরাণকে মিশিয়েছেন নির্দিষ্ট মাত্রায়। গতানুগতিক ধর্মীয় বা অলৌকিক আখ্যানের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিক সাহিত্য-চিন্তা প্রকাশের মাধ্যমে এ নাটকটি কীভাবে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে নিম্নে তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

১০.১ অস্তিত্ববাদী সংকট প্রকাশ

গিরিশ কারনাড বলেছেন, 'The playwright should have a contemporaneous sense.'[৩২] অর্থাৎ নাট্যকারের ঐতিহ্য চেতনায় সমকাল বারবার ছায়া ফেলে যায়। গিরিশ কারনাডের *হয়বদন* নাটকে যা সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয়। আধুনিক অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাবে *হয়বদন* নাটকে পুরাণকথার নবরূপায়ণ ঘটেছে। ভারতীয় পুরাণ ভাবনার মধ্যেও অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রভাব বিদ্যমান; উদাহরণ হিসেবে *মহাভারতে*র প্রসঙ্গ বিধৃত করা যায়। *মহাভারতে*র যুধিষ্ঠির দ্যূতসভায় নিজের ভাই, স্ত্রী ও নিজেকে পণ রেখে খেলায় হেরে যায়। দুর্যোধনের নির্দেশে দ্রৌপদীকে বিধ্বস্ত অবস্থায় জোরপূর্বক সভায় হাজির করা হলে ক্রোধে দগ্ধ দ্রৌপদী তার সঙ্গে ছলনার প্রতিবাদ করে। স্বামীর কৃতকর্মের দায় বহন না করে সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সোচ্চার হয় এবং লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পেতে দ্রৌপদী কৃষ্ণর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। 'তখন স্বয়ং ধর্ম বস্ত্রের রূপ ধরে তাকে আবৃত করলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণের রঞ্জিত এবং শুভ্র শত শত বসন আবির্ভূত হতে লাগলো।'[৩৩] পৌরাণিক অনুষঙ্গের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা *হয়বদন* নাটকের প্রতিটি চরিত্র অস্তিত্ববাদী সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়; যেখানে মানুষের পরিচয় কোনো প্রাক-নির্ধারিত দৈব সত্তা নয়, বরং তার নিজ নিজ কর্ম ও ইচ্ছার প্রতিফলন। এ নাটকে কালী মন্দিরে মাথা বদল হয়ে যাওয়া কপিল শুরুতে তার রূপান্তরকে মেনে নিতে না পারলেও নিজের শরীরকে পুনরায় পুনর্গঠন করে। এই আত্মনির্মাণের মধ্য দিয়ে সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধে উপনীত হয়। যেহেতু কপিলের শরীরে দেবদত্তের মাথা সংযুক্ত হয়েছে তাই সে পদ্মিনীকে স্ত্রী হিসেবে দাবি করে। অন্যদিকে 'মানুষের সব প্রত্যঙ্গের মধ্যে গুরুত্বে, অবস্থানে, মাথাই হচ্ছে সেরা।'[৩৪] এই যুক্তিতে আত্মতৃপ্ত দেবদত্তের মাথাবাহী মানুষটি পদ্মিনীর স্বামী হিসেবে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। দেবদত্তের বুদ্ধিমত্তা এবং কপিলের শক্তিমত্তার এক

অসম্ভব সংমিশ্রণ পদ্মিনী কামনা করলেও শেষ পর্যন্ত বিবিধ অপূর্ণতা নিয়ে প্রতিটি চরিত্র নির্দিষ্ট জীবনচক্রে আবর্তিত হয়। এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রের ভেতরেই নিজের জীবন বেছে নেয়ার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিদ্যমান । প্রকৃতপক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষাই মানুষের সর্বাপেক্ষা মৌলিক চেষ্টা। সার্ত্রে বলেন, '[...] man first of all exist, encounters himself, surges up in the world— and defines himself afterward.'[৩৫] প্রথাগত পৌরাণিক রচনায় চরিত্রসমূহকে অস্তিত্ব রক্ষায় অন্যের অনুকম্পা, ঈশ্বরের সহায়তা, দৈব বা কর্মফলের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে কারনাড অস্তিত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, কর্ম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইকে প্রধান করে তুলেছেন যা এই নাটককে একটি সফল আধুনিক অস্তিত্ববাদী সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১০.২ অ্যাবসার্ডবাদের ব্যবহার

পুরাণবিষয়ক রচনায় মানব জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা, যুক্তিহীনতা ও শূন্যতাবোধের মতো অনুভূতিকে শব্দরূপ দেয়া হয় অ্যাবসার্ডবাদের আলোকে; *হয়বদন* নাটকেও এসব লক্ষণ পরিদৃষ্ট। *হয়বদন* নাটকে পৌরাণিক রূপের আধুনিক প্রকাশে অ্যাবসার্ডবাদের সুমিত প্রয়োগ ঘটেছে। বস্তুত, আধুনিক 'absurd' বা উদ্ভট নাটক হলো থিয়েটারের এমন এক বিমূর্ত ধারা যেখানে প্রথাগত গল্পের কাঠামো, যুক্তিপূর্ণ সংলাপ এবং সুনির্দিষ্ট চরিত্রায়ণের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলা হয়। 'মানুষের মানস বিচ্ছিন্নতা, তার অসঙ্গতি এবং জীবনের ভবিষ্যৎ অর্থহীনতা অ্যাবসার্ড নাট্যকার তুলে আনতে চান তাঁর সৃষ্টিতে।'[৩৬] এ নাটকের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> It reflects the absurdity of human existence and human predicament in a dramatic and vivid manner, with the absurdity stemming mostly from a failure of communication. Language, drama, characters, and plot are contradictory to traditional norms of theater which almost do not clearly be presented but are all noticeable characteristics of absurd plays.[৩৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এই নাট্যধারা মহাবিশ্বের বিশালতায় মানুষের জীবনের অযৌক্তিকতা, লক্ষ্যহীনতা ও অনিশ্চয়তাকে উপজীব্য করেছে। পুরাণেও এই অ্যাবসার্ডিটির বীজ বিদ্যমান। *মহাভারতের* গান্ধারী দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন অন্ধ সেজে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল। এমনকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অধার্মিক পুত্রদের পরাজয় ঘটবে নিশ্চিত জেনেও সে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য কৃষ্ণকে দায়ী করে। কৃষ্ণের উদ্দেশে বলে : 'তোমার সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয়পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে।'[৩৮] গান্ধারীর এ-সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে তার চরিত্রের যুক্তিহীনতার দিকটি প্রতিষ্ঠা করে। অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ পুরাণধর্মী *হয়বদন* নাটকেও প্রচলিত নাটকের কাহিনির মতো পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি বরং উদ্ভট কাহিনির সন্নিবেশন ঘটেছে। নাটকে

কপিল আর দেবদত্তের মাথা পরিবর্তন, ঘোড়ামুখোর কথোপকথন, পুতুলের আলাপচারিতা সবই অবাস্তব। অধিকারীর ভাষ্যে দেবদত্ত-কপিল-পদ্মিনীর গল্প বর্ণনা এবং ধর্মপুর নামক কাল্পনিক রাজ্যের উল্লেখ আমাদের এই ধারণা দেয় যে নাট্যঘটনা বহু বছর আগে সংঘটিত হয়েছে। তবে নাটকের সমাপ্তিতে পদ্মিনীর ছেলের আবির্ভাব সময়কে বিভ্রান্ত করে তোলে ফলে এই নাটকে প্লটের সময়কাল নির্ধারণ করা কঠিন। দেবদত্ত-কপিল-পদ্মিনী এবং ঘোড়ামুখোর গল্পগুলো উভয়ক্ষেত্রেই মানুষের পরিচয় সংকট বড় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। উভয় গল্পের দৃঢ় অন্তর্নিহিত বার্তা হলো মানুষের অবস্থা দুর্ভোগ, বিশৃঙ্খলা ও চরম হতাশা। পৌরাণিক সাহিত্যের আখ্যানে অ্যাবসার্ডিটির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় এর উপাদান হিসেবে রূপক, অলৌকিকতা, ভয়ংকর বৈপরীত্য বা বিদ্রুপ বিদ্যমান। তবে পৌরাণিক সাহিত্যের আদলে নির্মিত রচনায় পরম্পরাহীন কাহিনি বা প্লট, যুক্তিবাদের অভাব, চরম হতাশার মাঝে হাস্যরসের মতো বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে এই তত্ত্বের আধুনিক প্রয়োগ ঘটেছে।

১০.৩ দূরত্বায়ন কৌশল ও লোকআঙ্গিক

পৌরাণিক আখ্যান সমৃদ্ধ লোকগাথাকে আধুনিক নাটকে যথাযথরূপে উপস্থাপনে দূরত্বায়ন কৌশল (Alienation Effect) একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে; *হয়বদন* নাটকে যার প্রকাশ উল্লেখ্য। নিরীক্ষাপ্রবণ গিরিশ কারনাড তাঁর *হয়বদন* নাটকে পশ্চিমা দূরত্বায়ন কৌশল এবং ভারতীয় লোকনাট্যের আঙ্গিক বিশেষ করে যক্ষগানের এক অনন্য দেশীয় সমন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রাচ্যের নাট্যশৈলী বিশেষ করে চীন ও ভারতীয় রীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বার্টল্ট ব্রেখট দূরত্বায়ন কৌশল তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। `This allows the audience to maintain a critical distance from the play's world and approach it through reason rather than emotion.`[৩৯] পৌরাণিক নাটকে সাধারণত দর্শককে গল্পের ভেতরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কারনাড এই রীতি অবলম্বন করে নাটকে যক্ষগানের ভাগবতের ন্যায় অধিকারী চরিত্রটিকে ব্যবহারের মাধ্যমে অভিনয়ের মাঝে একটি সচেতন দূরত্ব তৈরি করেছেন যা দর্শককে আবেগপ্রবণ হওয়ার পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর হতে সাহায্য করে। ফলত, নাটকে যখন পুতুলেরা কথা বলে বা অধিকারী দর্শকদের সাথে সরাসরি কথা বলে, তখন দর্শক বুঝতে পারে এটি নাটক; এই কৌশলটিই আধুনিক নাট্যতত্ত্বের একটি বড় বৈশিষ্ট্য যা এখানে পৌরাণিক আবহে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ব্যবহারটি আধুনিক হওয়ার মূল কারণ হলো, এটি প্রথাগত পৌরাণিক নাটকের মোহগ্রস্ততা ভেঙে দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের সংকট, পরিচয়হীনতা বা জীবনের অসংগতিকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিচার করার সুযোগ করে দেয়।

১০.৪ জাদুবাস্তববাদের নান্দনিক প্রকাশ

পৌরাণিক ও লৌকিক বাস্তবতার মেলবন্ধনে গিরিশ কারনাড *হয়বদন* নাটকের যে আধুনিক রূপায়ণ করেছেন সেখানে জাদুবাস্তববাদ একটি অন্যতম উপাচার। আধুনিক মানুষের যাপিত জীবনের চরম অস্থিরতা ও ভেতরের দ্বান্দ্বিকতাকে নাট্যকার যখন শুধু যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন, তখন অতিপ্রাকৃত বা জাদুময় অনুষঙ্গ ব্যবহার করে সেই রূঢ় বাস্তবতাকে কোমল করে তোলেন। `Magical realism combines realism and the fantastic in such a way that magical elements grow organically out of the reality portrayed.'[৪০] প্রকৃতপক্ষে, জাদুবাস্তববাদে জাদু ও জীবনকে আলাদা করা যায় না। জাদুবাস্তবতাকে অনুধাবন করতে হলে বর্ণনার জাদুময় মুহূর্ত ও পরিস্থিতির শরণাপন্ন হতে হয়।[৪১] পুরাণে জাদুবাস্তবতার রূপায়ণে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক উপাদানসমূহকে ধর্মীয়, সামাজিক প্রেক্ষাপটে অবলীলায় ব্যবহার করা হয়। এখানে দেবদেবীর ঐশ্বরিক ক্ষমতা, দিব্যদৃষ্টি, ইচ্ছামৃত্যু, শাপ ও বর প্রদান, সংকর সত্তা ইত্যাদি নানা বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে করে অবিশ্বাস্য ও জাদুকরী ঘটনাসমূহ বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব আখ্যানের সঙ্গে আলাদা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। *মহাভারতের* দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। *মহাভারতে* শত পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আলিঙ্গনের ছলে ভীমকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝতে পেরে কৃষ্ণ তার হাত দিয়ে ভীমকে সরিয়ে দেয় এবং বলশালী ধৃতরাষ্ট্র ভীমের সদৃশ লৌহ মূর্তিকে ভীম ভেবে সজোরে আলিঙ্গন করে ভেঙে ফেলে। আহত ধৃতরাষ্ট্র মাটিতে পড়ে গিয়ে ভীমের প্রতি কপট সহানুভূতি দেখায়। কৃষ্ণ তাকে বলেঃ 'মহারাজ, শোক করবেন না, আপনি ভীমকে বধ করেননি, তার প্রতিমূর্তিই চূর্ণ করেছেন।'[৪২] অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ভীমের মূর্তি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তার মধ্যে সত্য ও অবাস্তবের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হয় যা জাদুবাস্তবতার লক্ষণাক্রান্ত। *হয়বদন* নাটকে আত্মপরায়ণ দেবদত্ত তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংকটের কারণে কালী মন্দিরে গিয়ে নিজের মাথা উৎসর্গ করে এবং অপবাদ থেকে বাঁচতে কপিলও বন্ধুকে অনুসরণ করে নিজেকে বলিদান করে। দেবীর অনুগ্রহে পুনরুজ্জীবিত দুই দেহে পদ্মিনী ভুলবশত ওলটপালট মাথা প্রতিস্থাপন করে। বাস্তবিকভাবে অসম্ভব এই ঘটনা নাটকে এমন স্বাভাবিকভাবে ঘটে যায়, যা দর্শককে বাস্তব ও অলৌকিকের সীমারেখা ভুলিয়ে দেয়। এই বদলে যাওয়া মাথার বদৌলতে এক সময়ের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে এমন এক অবিশ্বাস্য রক্তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা দেবদত্ত এবং কপিলের বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যায়। যেমন :

> প। কী বলব! কী ভাবে বোঝাই। তোমরা দুজন গলা কেটে ফেলেছিলে, মা-র দয়ায় বেঁচেছ। কিন্তু অন্ধকারে— ভুল করে—আমি—মাগো—আমি তোমাদের মাথা ওলটপালট করে বসিয়েছি, এক্কেবারে উলটোপালটা। দয়া করো আমায়; আমার বাঁচার কোনো মানে নেই; দয়া করো!
>
> ক। ওলটপালট!
>
> দ। মাথা ?
>
> দ। ওলটপালট মাথা!
>
> ক। মাথা ওলটপালট!
>
> দ। কী অসম্ভব ব্যাপার! এতদিন আমরা কেবল বন্ধু ছিলাম।...
>
> দ। ও রকম কাণ্ড ভাবা যায় কখনো?[৪৩]

এই অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলো তাদের শরীর ও মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর যে বেদনা বহন করে, তা আদতে আধুনিক মানুষের পরিচয়হীনতা ও আত্মিক সংকটেরই এক প্রতীকী প্রকাশ। পুরাণে জাদুবাস্তবতার নিদর্শন প্রয়োগে চরিত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দৈবিক, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গ প্রাধান্য পায়। তবে কারনাড এখানে পুরাণের সংকর সত্তা বা অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন মানুষের বাহ্যিক রূপ ও অন্তর্গত সত্তার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করার জন্য, যা এই আখ্যানটিকে একটি গভীর আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দলিলে পরিণত করেছে। আধুনিক নাটকে জাদুবাস্তবতা কেবল অলৌকিকতা নয়, বরং মানুষের মনের গহিন সত্যকে অবাস্তব আবহে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরার এক নান্দনিক কৌশল।

১১. উপসংহার

গিরিশ কারনাডের *হয়বদন* নাটকটি নিছক প্রাচীন আখ্যানের চর্বিতচর্বণ নয় বরং এটি ঐতিহ্যিক পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও অস্তিত্ববাদী সংকটের প্রামাণ্য রচনা। কারনাড পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উপকাহিনি থেকে সংগৃহীত মস্তক বিনিময়ের অলৌকিক মোটিফকে সমকালীন বুদ্ধি ও শরীরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং খণ্ডিত অস্তিত্বের রূপকে প্রতিস্থাপনে প্রয়োগ করেছেন নিরীক্ষা। তিনি নাটকটির সার্থকতার পথ সন্ধান করেছেন বহুস্তরীয় নির্মাণের মাধ্যমে। একদিকে যক্ষগানের লোকঐতিহ্য অন্যদিকে ব্রেখটীয় 'দূরত্বায়ন কৌশল', অ্যাবসার্ডিটি এবং জাদুবাস্তববাদের মতো পাশ্চাত্য তত্ত্বের প্রলেপে মানব অস্তিত্বের অসম্পূর্ণতাকে ঈশ্বরহীনতার আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাটকে যে নতুন ভাবনার জন্ম দেয় সেখানে পদ্মিনীর অবদমিত কামনার মুক্তি এবং ঘোড়ামুখো চরিত্রের পূর্ণতা সন্ধানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক পৃথিবীতে পূর্ণতা একটি অলীক ধারণা মাত্র; কেননা মানুষের পরিচয় কোনো পূর্ব-নিরূপিত দৈব সত্তা নয়, বরং তার জৈবিক সংস্কার ও স্বাধীন ইচ্ছার এক জটিল সংঘাত। সুতরাং, পৌরাণিক পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তাত্ত্বিক সম্মিলন এবং ভাষার নিপুণ কারুকার্যে নাটকটিকে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে এক কালজয়ী এবং অপরিহার্য আধুনিক সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা চলে।

তথ্যনির্দেশ

১ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৭, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৮৪

২ তারেক রেজা, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিমানস ও শিল্পরীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৮০

৩ বুদ্ধদেব বসু, *মহাভারতের কথা*, এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৮

৪ সুদেব সিংহ, 'রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র ও শম্ভু মিত্র', *প্রসঙ্গ-গিরিশ কারনাড*, তাঁতঘর, কলকাতা, ২০২২, পৃ.৮৮

৫ দেবাশিষ রায়চৌধুরী, 'ইতিহাস ও পুরাণের আঙ্গিনায় এক ভারতীয় নাটককার', *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে গিরিশ কারনাড*, একুশশতক, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৫০

৬ বিদিশা মিশ্র, 'বদলে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর নাটক এবং চলচ্চিত্রের ভাষা', ২০২৪ https://samayupdates.in/entertainment-news-updates/special-article-about-actor-girish-karnad/, Accessed on 10/03/3026

৭ সুমন ভট্টাচার্য, গিরিশ কারনাড : সম্ভাব্যের শিলা—সম্ভাষণের লিপি, *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে গিরিশ কারনাড*, একুশশতক, কলকাতা, ২০২২, পৃ.৭০

৮ বোধিসত্ত্ব গুপ্ত, 'হয়বদন সময়ের বাস্তবতা, বাস্তবতার বিপন্নতা', *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে গিরিশ কারনাড*, একুশশতক, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১২৩

৯ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২০০

১০ গিরিশ কারনাড, *হয়বদন*, (অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ), প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৪৩০, পৃ. ৪২

১১ গিরিশ কারনাড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

১২ গিরিশ কারনাড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৩ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৬৭

১৪ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, *মহাভারত*, (সারানুবাদঃ রাজশেখর বসু), এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৫

১৫ গিরিশ কারনাড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৬ গিরিশ কারনাড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৭ শ্রী সুবোধ কুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১৬৬

১৮ *শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন* বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভাগবতম্*, পঞ্চমস্কন্ধ, (সম্পাদক: শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ), শ্রীচৈতন্যবাণী, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৬২

১৯ সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ১৪৩

২০ *শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন* বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভাগবতম্*, দশমস্কন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৮

২১ গিরিশ কারনাড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৩০ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬

৩১ উদ্ধৃত, ঋতম্ মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্গানুবাদে হয়বদনঃ হে পূর্ণ, তব...' *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে গিরিশ কারনাড*, একুশশতক, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৯৭

৩২ দিলীপ কুমার মিত্র, *আধুনিক ভারতীয় নাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ.২১৩

৩৩ *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন* ব্যাস, 'আদি পর্ব', *মহাভারত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

৩৪ গিরিশ কারনাড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৩৫ Jean Paul Sartre, *Existentialism and Humanism,* (Trans: Philip Mairet) Methuen & Co. Ltd, London, 1960, p. 27

৩৬ বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, (সম্পাদক: বেগম আকতার কামাল), অবসর, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬৬

৩৭ Jiang Zhu, `Analysis on the Artistic Features and Themes of the Theater of the Absurd,` *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 3, No. 8, Academy Publisher, Finland. 2013, pp. 1462-1466

৩৮ রাজশেখর বসু, 'স্ত্রী পর্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৭

৩৯ Weihua He, `Bertolt Brecht's theatrical concept of alienation effect and the Chinese application and transformation.` *Neohelicon*, Vol. 46, 2019.

৪০ Wendy B. Faris , `Scheherazade's Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.` *Magical Realism: Theory, History, Community*. (editor: Lois Parkison Zamora and Wendy B. Faris). Duke University Press, Durham & London. 1995, p.163

৪১ হামীম কামরুল হক, *জাদুবাস্তববাদ*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৯

৪২ রাজশেখর বসু, 'স্ত্রী পর্ব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৫

৪৩ গিরিশ কারনাড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১